শ্রীলঙ্কায় তামিল বিদ্রোহের অবসান

জাতিগত বৈষম্যের অবসান হবে কি?

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে কবি লিখেছিলেন – 'সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ, কাঞ্চণময় দেশ'। কবির সেই কাঞ্চণময় দেশে বহুদিন ধরে জাতিগত বিরোধের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলীর আপাত অবসান হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

গত ১৮ মে শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনী এলটিটিই'র সর্বশেষ ঘাঁটি মুল্লাইতিভু দখল এবং তাদের নেতা প্রভাকরণ-কে হত্যার মাধ্যমে তামিল বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে বলে ঘোষণা করে। তিনি ছিলেন তামিল সংগঠন লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলম বা এলটিটিই-র শীর্ষ নেতা। শ্রীলঙ্কান সরকারের ঘোষণা মতে, এর ফলে ২৬ বছর (বাস্তবে ৩০ বছরেরও বেশি) ধরে চলা তামিল বিদ্রোহীদের সাথে চলা রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের অবসান ঘটল। অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত তামিলরা তাদের সূর্যদেবতা (তামিল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাকরণ সূর্যদেবতা হিসেবেই আখ্যায়িত ছিলেন) প্রভাকরণের হত্যার বিচার এবং তামিলদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। অনেক মানবাধিকার সংগঠনও তামিলদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঘটনায় মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করার দাবি তুলেছে।

নেপথ্য কথা

১৭৯৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ছিল ব্রিটিশের উপনিবেশ। বর্তমানে দেশটির জনগোষ্ঠীর ৭৪ ভাগ হচ্ছে সিংহলি বৌদ্ধ, আর ১৫ ভাগ হচ্ছে তামিল হিন্দু। তামিলদের অবস্থান দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। ব্রিটিশ শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসকরা শ্রীলঙ্কায় চা বাগানের কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি তামিলকে দক্ষিণ ভারত এবং তামিলনাড়ু থেকে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে আসে। (যেমনভাবে বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে শ্রমিক যোগানো হয়েছে)। তাদের নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক হলেও পরবর্তীতে তারা লঙ্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে।

ব্রিটিশরা শ্রীলঙ্কায় শাসন-শোষণ চালানোর জন্য যেসব অর্থনৈতিক স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার বেশিরভাগই শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রস্থলে এবং পশ্চিমাঞ্চলে যা সিংহলি অধ্যুষিত। কিন্তু মিশনারি পরিচালিত ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হয় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তামিল অধ্যুষিত অঞ্চলে। তারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে সরকারি চাকরিসহ বেসরকারি খাত ও বিভিন্ন পেশায় যোগ দেবার চেষ্টা চালায়। ফলে বহু তামিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি করার উদ্দেশ্যে রাজধানীসহ পশ্চিমাঞ্চলে পাড়ি জমায়। অন্যদিকে পড়াশুনায় পিছিয়ে থাকার কারণে চাকুরি বা ব্যবসায় সিংহলিদের অংশগ্রহণ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এ কারণে অনেকেই মনে করেন তামিল-সিংহলিদের বিভেদ ও সংঘাতের উৎপত্তি এই অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিভেদ, যা প্রকারান্তরে ব্রিটিশের ডিভাইড এন্ড রুল (ভাগ কর - শাসন কর) নীতিরই ফল।

শ্রীলঙ্কায় ব্রিটিশ আমলে আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত প্রধানত ব্রিটিশ ও ভারতীয় বণিকরা। ব্যাংক ছিল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিংহলিরা তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা সিংহলিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত অধিকতর শিক্ষিত তামিলদের সাথে। এর ফলে সাধারণ সিংহলিদের মধ্যেও বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় যে তাদের পিছিয়ে থাকার জন্য দায়ী হচ্ছে তামিল এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী।

সংকটের প্রসারণ

১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা লাভের পরপরই তামিল শ্রমিকরা সিংহলী উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রধান আক্রোশের শিকার হয়। ওই সময় প্রণয়ন করা হয় 'সিলোন সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট' বা 'সিংহলিদের নাগরিক আইন অধ্যাদেশ' যার ফলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল শ্রমিকদের বেশির ভাগই শ্রীলঙ্কায় ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হারায়। তারা পরিণত হয় রাষ্ট্রবিহীন জাতিতে। ১৯৪৮ সালে দেশের আইনসভার নির্বাচনের পূর্বে তামিল ভোটারদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৩%। আর নতুন আইনের ফলে তামিল ভোটারদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ২০%। তামিল শ্রমিকদের এভাবে বঞ্চিত করে সিংহলিরা সহজেই আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে নেয়। এতে করে ভোটাধিকার বঞ্চিত তামিলদের সামনে সিংহলিদের প্রণীত আইনের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের সুযোগটুকুও বন্ধ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে ১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। ওই নির্বাচনে এস ডব্লিউ আর ডি বন্দরনায়েক (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার বাবা) নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সিংহলি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তখন থেকে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি চাকুরি, সেনাবাহিনী ইত্যাদি নানা জায়গায় তামিলদের কোণঠাসা করা শুরু হয়।

ঔপনিবেশিক আমলের অভিবাসী তামিলদের শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬২ এবং '৬৫ সালে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের তৎকালীন দুই প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে বলা হয়, শ্রীলঙ্কা থেকে ৬ লাখ তামিল অভিবাসীকে ১৫ বছরের মধ্যে ভারতে ফেরত পাঠানো হবে। আর ৩ লাখ ৭৩ হাজার তামিল পাবে শ্রীলঙ্কান নাগরিকত্ব। চুক্তি হলেও ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব বঞ্চিত তামিলরা কিন্তু বেশিরভাগই ভারতে ফেরত যায়নি। ক্ষোভ পুষে রেখে তারা শ্রীলঙ্কার মাটিতেই থেকে যায়। ফলে সমস্যা আরো এক ধাপ জটিলতা লাভ করে।

তামিলদের ওপর রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও নিপীড়ন

১. ভারত মহাসাগরের এপারে তামিলনাড়ু , ওপারে শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চল। মাঝখানে ৩০ কিমি সাগর। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আদিকাল থেকেই তামিলদের বসবাস। কিন্তু শ্রীলঙ্কান সরকার বিভিন্ন সময় সিংহলিদের বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ওই অঞ্চলে পাঠায় (যেভাবে আমাদের দেশে পার্বত্য জেলাগুলোতে বাঙালিদের পাঠানো হয়েছে)। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে বাত্তিকালোয়া অঞ্চলে গল-গয়া ড্যাম প্রজেক্টের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রজেক্টের ফলে যেসব তামিল বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তাদেরকেই সদ্য গড়ে তোলা জলাধারের পাশের জমি বরাদ্দ দেওয়ার কথা ছিল। এর পরিবর্তে সরকার অন্যায়ভাবে দক্ষিণাঞ্চল থেকে হাজার হাজার সিংহলিকে এনে জলাধারের পাশে বাস করার সুবিধা প্রদান করে। প্রজেক্ট থেকে প্রাপ্ত সুফল ভোগ করতে থাকে অভিবাসী সিংহলিরা। আর তামিলরা চলে যায় নিজভূমের প্রান্তিক অবস্থানে।

২. ১৯৫৬ সালে শ্রীলঙ্কার ভাষানীতি প্রবর্তিত হয়। নতুন রাষ্ট্রভাষানীতিতে বলা হল, যারা শুদ্ধভাবে সিংহলি ভাষা বলতে পারবে না তাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। সরকারের এ নীতির বিরুদ্ধে তামিলদের রাজনৈতিক সংগঠন ফেডারেল পার্টি প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু সিংহলি উগ্র জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা তামিলদের প্রতিবাদে কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ না করে নিপীড়নের পথ ধরে। নতুন ভাষানীতি কার্যকর হওয়ায় ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব লোপ পায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তামিল বেকার হয়ে পড়ে।

৩. ১৯৫৮ সালে তামিলবিরোধী দাঙ্গা চালিয়ে কমপক্ষে দুইশতাধিক তামিলকে হত্যা করা হয়, আহত হয় বহু তামিল। নির্বিচারে এদের সম্পদ লুঠ করা হয়। দাঙ্গার পরিণতিতে প্রায় ২৫ হাজার তামিল উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

৪. শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত করা এবং সাংস্কৃতিকভাবে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে শ্রীলঙ্কান সরকার তামিল জনগোষ্ঠীকে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতের তামিলনাড়ু থেকে তামিল ভাষায় লিখিত বই, পত্র-পত্রিকা, নির্মিত চলচ্চিত্র প্রভৃতি আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। এতে শ্রীলঙ্কার তামিল এবং ভারতের তামিলনাড়ুর তামিলদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কান তামিল ছাত্র-ছাত্রী যারা ভারতে পড়াশোনা করতে যায় তাদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এমনকি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রির জন্য পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হয়। এছাড়া ষাটের দশক থেকে মিশনারি স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করা শুরু হয়। এসব স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজির পরিবর্তে সিংহলি ও তামিল ভাষা প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে তামিল ও সিংহলিদের একসঙ্গে স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে তামিলরা আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

৫. ১৯৭২ সালে দেশটির পূর্বতন নাম সিংহল পাল্টে শ্রীলঙ্কা রাখা হয়। সংখ্যালঘু তামিল জনগোষ্ঠীর আপত্তি উপেক্ষা করে বৌদ্ধধর্মকে দেশের প্রধান ধর্ম হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

৬. ১৯৮১ সালের মে-জুন মাসে সিংহলিরা পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় জাফনায় ব্যাপক সহিংসতা চালায়। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় জাফনা বাজার, তামিল সংবাদপত্রের কার্যালয়, আইন সভার একাধিক সদস্যের বাসভবন। সিংহলিদের এ রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পায়নি জাফনা পাবলিক লাইব্রেরিটিও, যা ছিল তামিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এর ফলে তামিল সাহিত্য-সংস্কৃতি সংক্রান্ত দলিল, বই-পুস্তক সবই ধ্বংস হয়ে যায়। সহিংসতাকারীদের প্রতি পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরকারের নিরবতা এতই নগ্ন ছিল যে তা তামিলদের ক্ষোভকে আরো গভীর করে তোলে।

৭. ২৩ জুলাইকে তামিলরা পালন করে কালো দিবস হিসাবে। ১৯৮৩ সালের এ দিনে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় সিংহলিরা তামিলদের ওপর বর্বর আক্রমণ পরিচালনা করে। হত্যা করা হয় সহস্রাধিক তামিলকে, পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের ঘর-বাড়ি। প্রাণভয়ে অনেক তামিল দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মূলত এই ঘটনার পর থেকেই তামিলদের প্রতিবাদ সশস্ত্র পন্থায় পরিচালিত হতে থাকে, সরকারের সাথে তামিলদের বিরোধ অনিরসনীয় জায়গায় চলে যায়।

৮. ১৯৮৩ সালের পর থেকে সন্দেহভাজন তামিলদের গ্রেফতার, নির্যাতন এবং হত্যা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। জুলাইয়ের ঘটনার পর নির্যাতন চালিয়ে ৫৩ জন কারাবন্দি তামিলকে জেলখানার ভেতরে হত্যা করা হয়। ২০০০ সালে ডিটেনশন সেন্টারে নির্যাতনে প্রাণ হারায় ২৬ জন তামিল যুবক।

এলটিটিই এবং সশস্ত্র সংঘাতের সূচনা

তামিলদের অধিকার প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণে বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় ১৯৭২ সালে শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলীয় উপদ্বীপে তামিল নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ তামিল টাইগার্স নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। চার বছরের মধ্যেই এটি রূপান্তরিত হয় এলটিটিই-তে। তামিলরা এদেরকে ডাকত পতিয়াল (আমাদের সন্তান) অথবা রিলিয়াল (বাঘ) বলে। অন্যদিকে রাষ্ট্র-প্রশাসনসহ সিংহলীদের কাছে এদের পরিচিতি গড়ে ওঠে গ্রাসদাবাদি বা এক্সট্রিমিস্ট ও সন্ত্রাসী হিসাবে। ১৯৭৫ সালে জাফনার সাবেক মেয়র ও তৎকালীন শ্রীলঙ্কার ফ্রিডম পার্টির মনোনীত সাংসদ আলফ্রেড দুরায়াপ্পাকে হত্যার মধ্য দিয়ে তারা সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়।

১৯৭৬ সালে একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ‘তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট’ (টিইউএলএফ) গঠনের ফলে শ্রীলঙ্কার এই জাতিগত বৈষম্য ও বিরোধের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের সামনে চলে আসে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পৃথক তামিল রাষ্ট্র গঠনের জন্য এ জোট প্রচারণা চালায়। পরিণতিতে ’৭৭-এর নির্বাচনে তারা উত্তর ও মধ্যপ্রদেশে জয়লাভ করে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় সরকার এর বিরোধিতা করে শ্রীলঙ্কার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ’৭৮ সালে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে। এর প্রতিবাদে টিইউএলএফ-এর সদস্যরা সংসদ থেকে তাদের আসন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে তামিলদের আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। জাফনা, মুল্লাইতিভু এবং কিলিঞ্চি প্রভৃতি অঞ্চলে এলটিটিই-র আন্দোলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। অপরদিকে ভারতের তামিলনাড়ুর তামিলরা এলটিটিই-র আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে এলটিটিই উত্তর-মধ্যপ্রদেশে একক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। অধিকৃত এই অঞ্চলসমূহে তারা পৃথক রাষ্ট্রের মতোই শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। সেখানে তারা নিজস্ব এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে ব্যাংক, কোর্ট এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে এলটিটিই-র প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এত কিছুর পরও এলটিটিই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয়।

সংকট জিইয়ে রাখার পেছনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈতনীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জারি রাখার জন্য ভারত তামিল সমস্যা নিয়ে দ্বৈতনীতি গ্রহণ করে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে ভারত প্রত্যক্ষভাবে এ সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হয়। মূলত ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশেই ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ’র’ (রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং) তামিলদের প্রশিক্ষণ দান ও অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করতে থাকে। পরবর্তীতে তামিলদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইন্দিরা সরকার শ্রীলঙ্কান সরকারের সাথে চুক্তি করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের তামিলনাড়ুতে তামিলদের নিয়ন্ত্রণ করা। এই চুক্তির আওতায় ভারত তামিলদের দমনের জন্য শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। সেখানে তামিলদের সাথে যুদ্ধে ভারতের প্রায় ১২শ’ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আরোহন করে শ্রীলঙ্কার প্রতি ভারতের নীতির পরিবর্তন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালের চুক্তি। চুক্তিতে তামিলদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি প্রদেশ গঠন, সরকার গঠন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তামিল ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। কিন্তু ভারতের আসল লক্ষ্য ছিল অস্থিতিশীলতা বজায় রাখা। নিজেদের দ্বৈতনীতির খেসারত ভারতকে দিতে হয়। ১৯৯১ সালে এক আত্মঘাতি বোমা হামলায় নিহত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, যার জন্য এলটিটিই-কে দায়ী করা হয়।

একইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও এখানকার ভৌগলিক অবস্থানকে সামরিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তামিল সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে ভূমিকা পালন করেছে। কখনো তারা এ সমস্যা নিরসনের জন্য সোচ্চার হয়েছে, বিপরীতক্রমে গোপনে তামিলদের অস্ত্র সরবরাহও করেছে। যেমন, ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্ট জয়াবর্ধনের গৃহিত তামিল দমন অভিযানে নৌবাহিনী প্রেরণ করেছিল। শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্ব উপকূলে একটি নৌঘাঁটি স্থাপন এবং ভারত মহাসাগরসহ এ অঞ্চলে ভারতের ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য তারা ছিল সচেষ্ট।

প্রভাকরণের মৃত্যু ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অবসান

শ্রীলঙ্কান সরকারের কাছে প্রভাকরণ সন্ত্রাসবাদী নেতা হলেও তিনি ছিলেন তামিলদের অবিসংবাদিত নেতা। তামিল অনুসারীরা তাকে ‘সূর্যদেবতা’ বলে সম্বোধন করত। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তামিলদের ওপর সিংহলিদের জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে তামিলদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতা, ভারত-

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নানা কূটচাল প্রভাকরণ বা এলটিটিই-কে নিছক একটি অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী রাজনৈতিক সংগঠনে আবদ্ধ রাখেনি। তামিলদের একটি প্রবাসী সংগঠন, দক্ষিণ আমেরিকান তামিল মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট, তাদের বিবৃতিতে বলছে যে এলটিটিই একটি মাফিয়া-জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। অস্ত্র ও মাদক পাচার, শিশু-কিশোরদের যুদ্ধে ব্যবহার, জোরপূর্বক অর্থ সংগ্রহসহ এলটিটিই নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে নির্যাতন-নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

ধারণা করা হয়, এই দীর্ঘ যুদ্ধে মারা গেছে প্রায় এক লক্ষ সামরিক-বেসামরিক লোক। কিন্তু যুদ্ধ কি আদৌ শেষ হয়েছে? তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বা এলটিটিই'কে হয়ত আপাত দমন করা গেছে। কিন্তু তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর বিগত সময়ে শ্রীলঙ্কার শাসকরা, এবং সিংহলিরা, যে বৈষম্য ও বঞ্চনা চাপিয়ে এসেছে, তা কি আদৌ বন্ধ হবে? তাদের ওপর যুগ যুগ ধরে চেপে বসা জাতিগত নিপীড়নের কি অবসান হবে?

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর ধর্মই হল গ্রাম-শহরের, ধনী-দরিদ্রের, সাদা-কালোর, নারী-পুরুষের, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু – ইত্যাকার যত ধরনের বৈষম্য ও বিভেদ আছে সেগুলোকে টিকিয়ে রাখা শুধু নয়, এসব বৈষম্যজাত বিরোধকে উস্কে দেয়া। এর ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও হয় না, শ্রীলঙ্কায়ও হবে না। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও এসব বিরোধে ইন্ধন যুগিয়ে নিজেদের ফায়দা হাসিলের তালে থাকে। তামিলরা যদি তাদের ওপর সিংহলিদের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য ও নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদের অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত শ্রীলঙ্কা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সে আন্দোলন শুধু তামিলদের নয়, দরিদ্র, নিপীড়িত শ্রমজীবী সিংহলিসহ দেশের সকল গণতন্ত্রমনা জনগণের আন্দোলন, নিপীড়িত শ্রমজীবী সিংহলিসহ দেশের সকল গণতন্ত্রমনা জনগণের আন্দোলন।